গবেষণা সিরিজ-১৪

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী

মু'মিন ও কাফিরের সংজ্ঞা এবং শ্রেনী বিভাগ

প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান
F.R.C.S (Glasgow)

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী

ম'মিন ও কাফিরের সংজ্ঞা এবং শ্রেণীবিভাগ

প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান

F.R.C.S (Glasgow)

জেনারেল ও ল্যাপারোসকপিক সার্জন

প্রফেসর অব সার্জারী

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রকাশক

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
৩৬৫ নিউডিওএইচএস
রোড নং ২৮, মহাখালী
ঢাকা, বাংলাদেশ
Web site: revivedislam.com

প্রকাশকাল

১ম প্রকাশ : জুন ২০০৩
২য় সংস্করণ : মে ২০০৭
৩য় সংস্করণ : নভেম্বর ২০০৮

কম্পিউটার কম্পোজ
আম্মারস কম্পিউটার
যোগাযোগ: ০১৯১৭০১৭৮৯২

মুদ্রণ ও বাঁধাই
দেশ প্রিন্টার্স
১০ জয়চন্দ্র ঘোষ লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা
ফোন : ৭১২২৮৬৫
০১৭১২-১২৬০৫৮

মূল্য ২০.০০ টাকা

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা নং

১. ডাক্তার হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম ৩
২. পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ ৭
৩. মূল বিষয় ১৭
৪. মু'মিনের সংজ্ঞা ১৭
৫. আমলে সালের সজ্ঞা ১৮
৬. মৌলিকত্ব বা গুরুত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে আমলে সালের শ্রেণী বিভাগ ১৮
৭. ঈমান না থাকলে আমলে সালেহ কবুল না হওয়ার কারণ ১৯
৮. যে সকল শর্ত পূরণ না করে আমলে সালেহ্ পালন করলে মু'মিনের সওয়াব বা নেকী হবে না ২০
৯. গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ ২১
১০. বড়, মৌলিক বা কবীরা আমলে সালেহ্ ছাড়ার পর যে সকল ধরণের গুনাহ্ হওয়া সম্ভব ২২
১১. ছোট, অমৌলিক বা ছগীরা আমলে সালেহ্ ছাড়ার পর যে ধরণের গুনাহ্ হওয়া সম্ভব। ২৩
১২. মু'মিনে শ্রেণীবিভাগ ২৩
১৩.নেক্কার মু'মিনের শ্রেণীবিভাগ ২৩
১৪. গুনাহ্গার মু'মিনের শ্রেণীবিভাগ ২৪
১৫. বিভিন্ন শ্রেণীর গুনাহ্গার বলে গণ্য হওয়ার কারণ ২৫
১৬. কাফিরের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ ২৬
১৭. মুনাফিক বলে গণ্য হওয়ার কারণ তথা মুনাফিকদের শনাক্ত বা চেনার উপায় ২৭
১৮. মুনাফিক বলে গণ্য হওয়া তথা মুনাফিকদের শনাক্ত করার উপায়সমূহের সারসংক্ষেপ ৩৪
১৯. গুনাহ্গার মু'মিন বা কাফিরদের, নেক্কার মু'মিন হওয়ার উপায় ৩৫
২০. ঈমান ও আমলের উপর ভিত্তিকরে জীবিত অবস্থায় পৃথিবীর সকল মানুষ যে সকল বিভাগে বিভক্ত থাকবে ৩৫
২১. ঈমান ও আমলের উপর ভিত্তি করে মৃত্যুর সময় পৃথিবীর সকল মানুষ যে সকল বিভাগে বিভক্ত থাকবে ৩৬
২২. ঈমান ও আমলের উপর ভিত্তিকরে মানুষের শ্রেণীবিভাগের চিত্ররূপ ৩৭
২৩. শেষ কথা ৩৭

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ডাক্তার হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ,

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ্। আমি একজন ডাক্তার (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, ডাক্তারি বিষয় বাদ দিয়ে একজন ডাক্তার কেন এ বিষয়ে কলম ধরল? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার।

ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশে-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি, ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। বিলাত থেকে ফিরে এসে আমার মনে হল, জীবিকা অর্জনের জন্যে বড় বড় বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রী করেছি, এখন যদি পবিত্র কুরআন তাফসীরসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, 'ইংরেজি ভাষায় বড় বড় বই পড়ে বড় ডাক্তার হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন শরীফ) পাঠিয়েছিলাম, সেটি কি তরজমাসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেব?'

এ উপলব্ধিটি আসার পর আমি কুরআন শরীফ তাফসীরসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষা জীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বুঝার অভাবটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন শরীফ পড়তে যেয়ে দেখি, ইরাকে যে সব সাধারণ আরবী বলতাম, তার অনেক শব্দই ওখানে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন শরীফ পড়তে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে ১, ২, ৫, ১০ আয়াত বা যতটুকু পারা যায়, বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন শরীফ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি লাইনও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্যে কয়েকখানা তাফসীর দেখেছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ শেষ করতে আমার প্রায় তিন বছর সময় লাগে।

পুরো কুরআন শরীফ তথা ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মৌলিক বিষয়সহ আরো অনেক বিষয় জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর সাধারণ মানুষের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য দেখে।

এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দিচ্ছিল। সর্বোপরি, কুরআনের এই আয়াত আমাকে লিখতে বাধ্য করল।

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيْلاً ۙ أُوْلَئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ.

অর্থঃ 'নিশ্চয়ই যারা, আল্লাহ (তাঁর) কিতাবে যা নাযিল করেছেন তা গোপন করে এবং বিনিময়ে অল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা যেন পেট আগুন দিয়ে ভরে। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।' (২, বাকারা : ১৭৪)

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ বলছেন, তিনি কুরআনে যে সব বিধান নাযিল করেছেন, জানা সত্ত্বেও যারা সেগুলো বলে না বা মানুষকে জানায় না এবং এর বিনিময়ে সামান্য কিছু পায় অর্থাৎ সামান্য ক্ষতি এড়াতে তথা ছোট ওজরের কারণে এমনটি করে, তারা যেন তাদের পেট আগুনে ভরলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না (ঐ দিন এটি একটি সাংঘাতিক দুর্ভাগ্য হবে) এবং তাদের পবিত্র করা হবে না (অর্থাৎ তাদের ছোট-খাট গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের ছোট-খাট গুনাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু যারা কুরআন জেনে তা গোপন করবে, তাদের তা করা হবে না)। তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআন জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্যে কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে, তা থেকে বাঁচার জন্যে আমি ডাক্তার হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কিভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় সূরা আরাফের ২নং আয়াতটি আমার মনে পড়ল। আয়াতটি হচ্ছে—

كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ .

অর্থ: এটা (আল-কুরআন) একটি কিতাব। এটি তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে এ জন্যে যে, এর বক্তব্য দ্বারা তুমি মানুষকে সতর্ক করবে, ভয় দেখাবে। তাই (কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে) তোমার অন্তরে যেন কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি না আসে।

ব্যাখ্যাঃ কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার সময় সাধারণ মানুষের অন্তরে দুটো অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে—

১. কুরআনের বক্তব্য সঠিকভাবে বুঝতে না পারার কারণে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।
২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে অসামঞ্জস্যশীল বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থাকে (বিশেষ করে ২য়টিকে) এড়ানোর (Overcome) জন্যে সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে, কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা, যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্যে তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটো সমূলে উৎপাটন করার জন্যে আল্লাহ্ এই আয়াতে রাসূলের সা. মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন, মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনই কুরআনের বক্তব্যকে লুকাবে না বা ঘুরিয়ে বলবে না।

কুরআনের অন্য জায়গায় (গাশিয়াহঃ ২২, নিসাঃ ৮০) আল্লাহ্ রাসূলকে সা. বলেছেন, পৃথিবীর সকল মানুষ কখনই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না।

তাই তুমি কুরআনের বক্তব্য (না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে) মানুষের নিকট উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্যে পুলিশের ন্যায় কাজ করা তোমার কাজ নয়। কুরআনের এই সব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই, আমার কথা বা লেখনীতে কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করব।

কুরআন শরীফ পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইল না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মেশকাত শরীফ (যেখানে সিয়াহ সিত্তার প্রায় সমস্ত হাদীস এবং তার বাইরেরও অনেক হাদীসের বর্ণনা আছে) বিস্তারিত পড়ার পর আমি লেখা আরম্ভ করি। বর্তমান লেখা আরম্ভ করি ৩০.০১.২০০৩ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে 'কুরআনিআ' (কুরআন নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি, তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রাসূল আ. বাদে পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ, যদি এই লেখায় কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব এবং সেটি সঠিক হলে, পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমত কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন—এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

ইসলামী জীবন বিধানে যে কোন বিষয়ে তথ্যের আলাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি– আল-কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি। পুস্তিকার জন্যে এই তিনটি উৎস থেকেই তথ্য নেয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেয়া যাক, যা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে মাধ্যম তিনটিকে যথাযথভাবে ব্যবহারের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ-

ক. আল-কুরআন

কোন কিছু পরিচালনার মৌলিক বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হচ্ছে ঐটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দেন। লক্ষ্য করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোন জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা চালানোর মৌলিক বিষয়গুলো সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্যে করেন যে, ভোক্তারা যেন ঐ যন্ত্রটা চালানোর মৌলিক বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই বুদ্ধিটা ইঞ্জিনিয়াররা পেয়েছে মহান আলাহ থেকে। আলাহই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়াবলী সম্বলিত ম্যানুয়াল বা কিতাব সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এটা আলাহ এ জন্যে করেছেন যে, মানুষ যেন তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়গুলোতে ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আলাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল-কুরআন। আলাহর এটা ঠিক করা ছিল যে, রাসূল মুহাম্মদ সা. এর পর আর কোন নবী-রাসূল আ. দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল-কুরআনের বিষয়গুলো যাতে রাসূল সা. দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর, সময়ের আবর্তে, মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোন কমবেশি না হয়ে যায়, সে জন্যে কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রাসূলের সা. মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ কেন, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন শরীফ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যে সকল বিষয়ের উপরে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে ঐ সব বিষয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হচ্ছে, সব ক'টি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোন বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আর একটা দিক অন্য আয়াতে উপস্থাপন করা হয়েছে অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যেই ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাসীর প্রমুখ মনীষী বলেছেন, কুরআনের তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কুরআনের তাফসীর কুরআন দ্বারা করা। তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে, একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সূরা নাহলের ৫২ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআনে পরস্পরবিরোধী কোন কথা নেই।

আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল-কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে আমি এই পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছি।

খ. সুন্নাহ

কুরআনের বক্তব্যগুলোর বাস্তব রূপ হল রাসূল সা. এর জীবনচরিত বা সুন্নাহ। তাই কুরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা যদি কোন বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায়, তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। সুন্নাহকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে হাদীসে। এ জন্যে হাদীসকে এই পুস্তকে তথ্যের ২য় উৎস হিসাবে ধরা হয়েছে।

হাদীসের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের বিপরীত হয়, তবে নির্দ্বিধায় সেই হাদীসটিকে মিথ্যা বা বানানো হাদীস বলে অথবা তার প্রচলিত ব্যাখ্যাকে ভুল বলে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। সে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ যতই গুণান্বিত হোক না কেন। কারণ, কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীত কোন কথা বা কাজ রাসূল সা. কোনক্রমেই বলতে বা করতে পারেন না। পক্ষান্তরে কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য হয়, তবে সেই হাদীসটিকে শক্তিশালী হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তার বর্ণনাকারীগণের মধ্যে কিছু দুর্বলতা থাকলেও।

কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা ছাড়াও রাসূল সা. আরো কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই বা সেগুলো কুরআনের কোন বক্তব্যের ব্যাখ্যা বা বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়ও নয়। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস থেকেও কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌছাতে হলে ঐ বিষয় বর্ণিত সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছাতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীসের বক্তব্য দুর্বল হাদীসের বিপরীতধর্মী বক্তব্যকে রহিত (Cancel) করে দেয়।

গ. বিবেক-বুদ্ধি

আল-কুরআনের সূরা ৯১, আশ-শামছের ৭-১০ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন-

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا.قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا.

অর্থ: শপথ মানুষের মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে ইলহামের মাধ্যমে পাপ ও সৎ কাজের জ্ঞান দিয়েছেন। যে তাকে উৎকর্ষিত করল সে সফল হল। আর যে তাকে অবদমিত করল সে ব্যর্থ হল।

ব্যাখ্যাঃ এখানে প্রথমে আল্লাহ্ জানিয়েছেন তিনি মানুষের মনকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর বলেছেন তিনি ইলহাম তথা অতিপ্রাকৃতিকভাবে ঐ মনকে কোনটি ভুল (পাপ) এবং কোনটি সঠিক (সৎ কাজ) তা জানিয়ে দেন। এরপর বলেছেন যে ঐ মনকে উৎকর্ষিত করবে সে সফলকাম হবে এবং যে তাকে অবদমিত করবে সে ব্যর্থ হবে। মানুষের এই মনকে বিবেক এবং বিবেক নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধিকে বিবেক-বুদ্ধি বলে।

আর এই বিবেকের ব্যাপারে রাসূল সা. এর বক্তব্য হচ্ছে-

وَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَ السَّلَامُ لِـــوَابِصَةَ (رض) جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَ الاِثْمِ ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَجَمَعَ اَصَابِعَهُ فَضَرَبَ بِهَا صَدْرَهُ. وَ قَالَ اسْتَفْتِ نَفْسَكَ وَ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ ثَلاَثًا. اَلْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ اِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ اِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالاِثْمُ مَا حَاكَ فِى النَّفْسِ وَ تَرَدَّدَ فِى الصَّدْرِ وَاِنْ اَفْتَاكَ النَّاسُ.

অর্থঃ রাসূল সা. ওয়াবেছা রা. কে বললেন, তুমি কি আমার নিকট নেকি ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললোঃ হ্যাঁ। অতঃপর তিনি আংগুলগুলো একত্র করে নিজের হাত বুকে মারলেন এবং বললেন, তোমার নিজের নফস ও অন্তরের নিকট উত্তর জিজ্ঞাসা কর। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন, যে বিষয়ে তোমার নফস ও অন্তর স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে, তাই নেকী। আর পাপ হলো সেটি, যা তোমার মনে সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত বা অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়।

(আহমদ, তিরমিজি)

ব্যাখ্যাঃ হাদীসখানিতে রাসূল সা. স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, মানুষের অন্তর তথা বিবেক যে কথা বা কাজে সায় দেয় বা স্বস্তি অনুভব করে, তা হবে ইসলামের দৃষ্টিতে নেক, সৎ, ভাল বা সিদ্ধ কথা বা কাজ। আর যে কথা বা কাজে মানুষের অন্তর সায় দেয় না বা অস্বস্তি ও খুঁতখুঁত অনুভব করে তা হবে ইসলামের দৃষ্টিতে গুনাহ, খারাপ বা নিষিদ্ধ কাজ।

তবে অন্য হাদীসে উলেখ আছে এবং সাধারণভাবে আমরা সকলেও জানি বিবেক পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দ্বারা পরিবর্তিত হয়। তাই বিবেক-বিরুদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার আগে তা যেমন কুরআন-হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে তেমনই বিবেক-সিদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে অগ্রাহ্য করার আগেও তা কুরআন-হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে।

পবিত্র কুরআনে এই বিবেক-বুদ্ধিকে عَقْلَ বলা হয়েছে। এই عَقْلَ শব্দটিকে আলাহ- اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ ، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ، لاَ يَعْقِلُوْنَ ، اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ. ইত্যাদিভাবে মোট ৪৯ বার কুরআনে ব্যবহার করেছেন। শব্দটি তিনি ব্যবহার

করেছেন প্রধানত ইসলামকে জানা ও বুঝার জন্যে কুরআন ও সুন্নাহের সঙ্গে বিবেক-বুদ্ধিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে, না হয় ঐ কাজে বিবেক-বুদ্ধি না খাটানোর দরুন তিরস্কার করার জন্যে।

বিবেক-বুদ্ধি খাটানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই আল্লাহ কুরআনে শব্দটি এতবার উলেখ করেছেন। তাছাড়া এটিকে আলাহ কী পরিমাণ গুরুত্ব দিয়েছেন, তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝা যায় নিম্নের ৩টি আয়াতের মাধ্যমে-

১. সূরা ৮, আনফালের ২২ নং আয়াতে আলাহ বলেছেন :

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لاَ يَعْقِلُونَ.

অর্থ: নিশ্চয়ই আলাহর নিকট নিকৃষ্টতম জন্তু হচ্ছে সেই সব বধির-বোবা লোক, যারা জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না।

২. সূরা ১০, ইউনুস-এর ১০০ নং আয়াতে আলাহ বলেছেন :

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لاَ يَعْقِلُوْنَ.

অর্থ: যারা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করে না, তিনি তাদের উপর অকল্যাণ চাপিয়ে দেন (ভুল চেপে বসে)।

৩. সূরা ৬৭, মুলকের ১০ নং আয়াতে আলাহ বলেছেন:

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيْرِ.

অর্থ: জাহান্নামীরা আরো বলবে, যদি আমরা (নবী-রাসূলদের) কথা শুনতাম এবং বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে তা থেকে শিক্ষা নেয়ার চেষ্টা করতাম, তাহলে আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হত না।

ব্যাখ্যা: আয়াতটিতে দোযখের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যে কথা বলবে তা উলেখ করা হয়েছে। তারা বলবে, 'আমরা যদি পৃথিবীতে নবী-রাসূলদের তথা কুরআন ও হাদীসের কথা শুনতাম এবং বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে তা থেকে শিক্ষা নেয়ার চেষ্টা করতাম, তবে আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হতো না।' কারণ বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে কুরআন ও হাদীস থেকে শিক্ষা নেয়ার চেষ্টা করলে তারা ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করতে পারত এবং সহজেই বুঝতে পারত যে, কুরআন ও হাদীসের (প্রায়

সব) কথা বিবেক-বুদ্ধিসম্মত। ফলে তারা তা সহজে মেনে নিতে ও অনুসরণ করতে পারত। আর তাহলে তাদের দোযখে আসতে হত না। আয়াতটি থেকে বুঝা যায়, কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে না বুঝা দোযখে যাওয়ার একটা প্রাথমিক কারণ হবে।

সুধী পাঠক, চিন্তা করে দেখুন, কুরআনের তথা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগানো এবং চিন্তা-গবেষণা করাকে আল্লাহ কী অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এই বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-গবেষণার ব্যবহারকে তিনি কোন বিশেষ যুগের মানুষের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেননি। কারণ, মানব সভ্যতার অগ্রগতির (Development) সঙ্গে সঙ্গে কুরআনের কোন কোন আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা নতুন তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে মানুষের নিকট আরো পরিষ্কার হয়ে ধরা দিবে। এ কথাই রাসূল সা. তাঁর দুটো হাদীসের মাধ্যমে এভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রথম হাদীসটি অনেক বড়, তাই সংক্ষেপে তা উপস্থাপন করা হল-

১. হযরত আবু বকরা রা. বলেন, নবী করিম সা. ১০ জিলহজ্জ কুরবানির দিনে আমাদের এক ভাষণ দিলেন এবং বললেন, বলো, আমি কি তোমাদেরকে আল্লাহর নির্দেশ পৌছাই নাই? আমরা বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। তখন তিনি বললেন, 'হে খোদা, তুমি সাক্ষী থাক।' অতঃপর বললেন, 'উপস্থিত প্রত্যেকে যেন অনুপস্থিতকে এ কথা পৌছিয়ে দেয়। কেননা, পরে পৌছানো ব্যক্তিদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যে আসল শ্রোতা অপেক্ষাও এর পক্ষে অধিক উপলব্ধিকারী ও রক্ষাকারী হতে পারে'। (বুখারী ও মুসলিম)
হাদীসটির 'কেননা' শব্দের আগের অংশটুকু বহুল প্রচারিত কিন্তু 'কেননা'র পরের অংশটুকু যে কোন কারণেই হোক একেবারেই প্রচার পায় নাই।
২. 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার বাণী শ্রবণ করেছে, তা স্মরণ ও সংরক্ষণ করেছে এবং অন্যদের কাছে পৌছে দিয়েছে। জ্ঞানের অনেক বাহক নিজে জ্ঞানী নয়। আবার জ্ঞানের অনেক বাহক নিজের চেয়ে অধিক জ্ঞানীর কাছে তা পৌছে দেয়'।
(তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারেমি, বায়হাকি)

মহান আল্লাহ্ তো কুরআনের বক্তব্যকে চোখ-কান বন্ধ করে মেনে নিতে বলতে পারতেন; কিন্তু তা না বলে তিনি উল্টো কুরআনের বক্তব্যকে বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝার ব্যাপারে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এর প্রধান কয়েকটি কারণ হচ্ছে-

ক. বিবেক-বুদ্ধি সকল মানুষের নিকট সকল সময় উপস্থিত থাকে,

খ. বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে সিদ্ধান্তে পৌঁছা যেমন সহজ তেমন তাতে সময়ও খুব কম লাগে,

গ. কোন বিষয় বিবেক-সিদ্ধ হলে তা গ্রহণ করা, মনের প্রশান্তি নিয়ে তা আমল করা এবং তার উপর দৃঢ় পদে দাঁড়িয়ে থাকা সহজ হয় এবং

ঘ. অল্প কিছু অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) বিষয় বাদে ইসলামে চিরন্তনভাবে বিবেক-বুদ্ধির বাইরে কোন কথা বা বিষয় নেই।

তাই, বিবেক-বুদ্ধির রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি উৎস হিসাবে নেয়া হয়েছে। তবে বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে-

ক. আল্লাহর দেয়া বিবেক বিপরীত শিক্ষা ও পরিবেশের দ্বারা পরিবর্তিত হয়, তবে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না,

খ. সঠিক বা সম্পূরক শিক্ষা ও পরিবেশ পেলে বিবেক উৎকর্ষিত হয়ে কুরআন-হাদীসের কাছাকাছি পৌঁছে যায় কিন্তু একেবারে সমান হয় না এবং

গ. কুরআন বা মুতাওয়াতির হাদীসের কোন বক্তব্য যদি মানুষের বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী না বুঝা যায় তবুও তাকে সত্য বলে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করতে হবে। কারণ, কুরআনের বিষয়গুলো কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই মানুষের জ্ঞান একটি বিশেষ স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত কুরআনের কোন কোন আয়াতের সঠিক অর্থ বুঝে না-ও আসতে পারে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি আরো পরিষ্কার হবে বলে আশা করি।

১. রকেটে করে গ্রহ-উপগ্রহে স্বল্প সময়ে যাওয়ার জ্ঞান আয়ত্তে আসার পর রাসূলের সা. মেরাজ বুঝা ও বিশ্বাস করা সহজ হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তায়ালা

বুরাক নামক বাহনে করে 'সিদরাতুল মুনতাহা' পর্যন্ত এবং তারপর 'রফরফ' নামক বাহনে করে আরশে আজিম পর্যন্ত, অতি স্বল্প সময়ে রাসূল সা. কে নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়ে আবার দুনিয়ায় ফেরত পাঠিয়েছিলেন।

২. সূরা যিলযাল-এর ৭ ও ৮ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন, দুনিয়াতে বিন্দু পরিমাণ ভাল কাজ করলে তা মানুষকে কিয়ামতের দিন দেখানো হবে, আবার বিন্দু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও ঐ দিন দেখানো হবে। ভিডিও রেকর্ডিং (Video Recording)-এর জ্ঞান আয়ত্তে আসার আগ পর্যন্ত মানুষের পক্ষে এই 'দেখানো' শব্দটি সঠিকভাবে বুঝা সহজ ছিল না। তাই তাফসীরেও এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা এসেছে। কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পারছি, মানুষের ২৪ ঘন্টার কর্মকাণ্ড আল্লাহ্ তাঁর রেকর্ডিং কর্মচারী (ফেরেশতা) দিয়ে ভিডিও রেকর্ড করে কম্পিউটার ডিসকে (Computer disk) সংরক্ষিত রাখছেন এবং এটিই শেষ বিচারের দিন 'দেখিয়ে' বিচার করা হবে।

৩. মায়ের গর্ভে মানুষের ভ্রূণের বৃদ্ধির স্তর (Developmental steps) সম্বন্ধে কুরআনের যে সকল আয়াত আছে, আগের তাফসীরকারকগণ তার সঠিক তাফসীর করতে পারেন নাই, বিজ্ঞানের উন্নতি ঐ স্তরে না পৌঁছার কারণে। কিন্তু এখন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণের বৃদ্ধির (Embryological development) জ্ঞান যতই মানুষের আয়ত্তে আসছে, ততই কুরআনের ঐ আয়াতের বর্ণনা করা তথ্যগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে।

৪. কুরআনের সূরা হাদিদে বলা হয়েছে, হাদিদ অর্থাৎ লোহা বা ধাতু (Metal) এর মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি। এই 'প্রচণ্ড শক্তি' বলতে আগের তাফসীরকারকগণ বলেছেন তরবারি, বন্দুক, কামান ইত্যাদির শক্তি। কিন্তু এখন বুঝা যাচ্ছে, এটি হচ্ছে পরমাণু শক্তি (Atomic energy)।

বিবেক-বুদ্ধি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'পবিত্র কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন' নামক বইটিতে।

কিয়াস ও ইজমা

যে সকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহে কোন বক্তব্য নেই বা থাকা বক্তব্যের একের অধিক অর্থ বা ব্যাখ্যা করার সুযোগ আছে, সে সকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহের অন্য বক্তব্যের সাথে বিবেক-বুদ্ধি মিলিয়ে সিদ্ধান্তে আসাকে কিয়াস (Deduction) বলে। আর কোন বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফলাফল এক হওয়া বা কারো কিয়াসের ব্যাপারে সকলের একমত হওয়াকে ইজমা (Concensus) বলে। তাই সহজেই বুঝা যায় কিয়াস বা ইজমা ইসলামের মূল উৎস নয় বরং তা হল আলাহ্ প্রদত্ত উৎস তিনটি তথা কুরআন, সুন্নাহ্ ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা। অর্থাৎ কিয়াস ও ইজমার মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহের সাথে আলাহ্ প্রদত্ত তৃতীয় উৎসটি তথা বিবেক-বুদ্ধিও উপস্থিত আছে।

ইজমাকে ইসলামী জীবন বিধানের একটি দলিল ধরা হলেও মনে রাখতে হবে ইজমার সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার উন্নতির সাথে সাথে কুরআন ও সুন্নাহের ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এর কয়েকটি উদাহরণ পূর্বে উলেখ করা হয়েছে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মত অন্য যে কোন বিষয়ে তা হতে পারে।

সিদ্ধান্তে পৌছাতে যে ক্রমধারা অনুযায়ী উৎসসমূহ বইটিতে ব্যবহার করা হয়েছে

যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে, মূল উৎস তিনটি অর্থাৎ কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলাটি মহান আলাহ্ সার-সংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে। আর রাসূল সা. ও সুন্নাহের মাধ্যমে সে ফর্মুলাটি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ফর্মুলাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'ইসলামে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলা' নামক বইটিতে। তবে ফর্মুলার চলমান চিত্রটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করা হল।

ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলার চিত্ররূপ

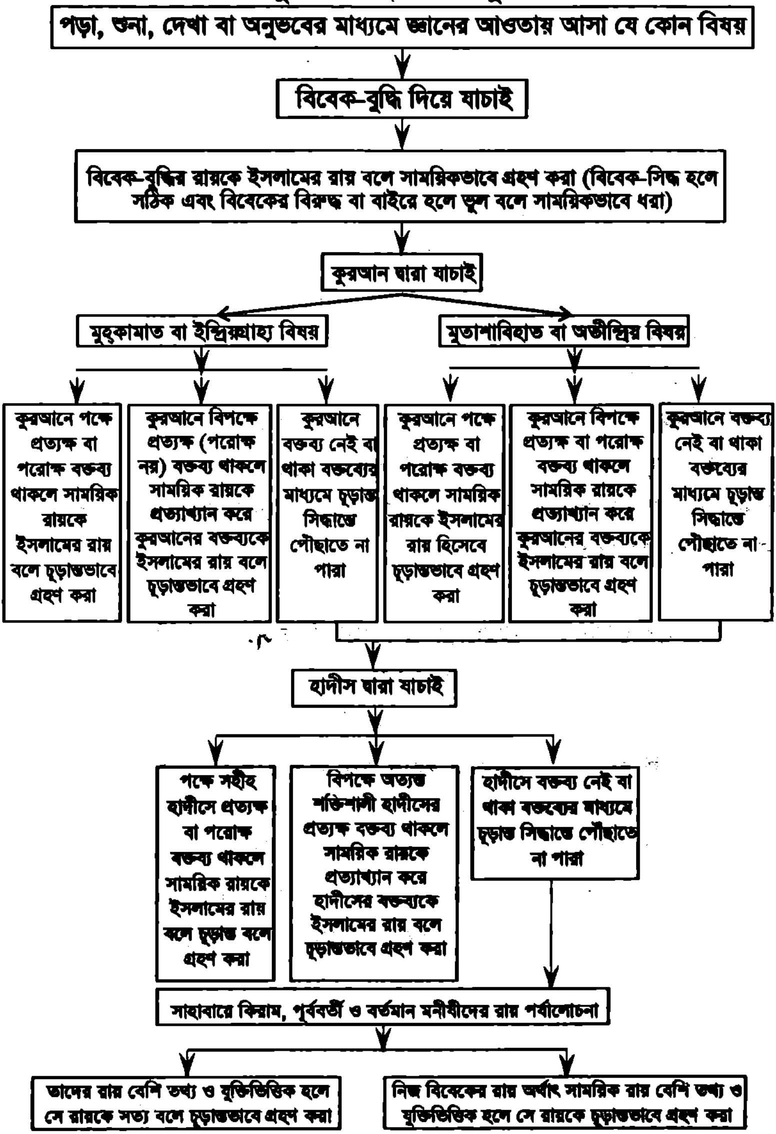

মূল বিষয়

মু'মিন ও কাফির ইসলামী জীবন বিধানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দু'টি মৌলিক শব্দ, বিষয় বা পরিভাষা। অধিকাংশ মুসলমানের ধারণা ও বাস্তব আমল দেখলে সহজেই বুঝা যায়, বিষয় দু'টির সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে তাদের ধারণা-বিশ্বাস আর ঐ ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ ও বিবেকের বক্তব্যের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। এর ফলস্বরূপ সওয়াব ও গুনাহ হওয়া না হওয়া এবং বেহেশত ও দোযখ পাওয়া না পাওয়া সম্বন্ধে বর্তমান মুসলমান সমাজে ব্যাপক ভুল ধারণা চালু হয়ে গিয়েছে। আর ঐ ভুল ধারণা মুসলমান সমাজ বা দেশে জীবনের সকল দিকে যে কল্যাণকর অবস্থা বিরাজমান হওয়ার কথা ছিল (ইসলামের স্বর্ণযুগে যা হয়েও ছিল) তা না হওয়া বা তার বিপরীত অবস্থা হওয়ার পেছনে বিরাট ভূমিকা রাখছে।

তাই মুসলামান তথা সকল মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে ঐ তিনটি বিষয়ের কুরআন-সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি সম্মত তথা প্রকৃত সংজ্ঞা, ব্যাখ্যা ও শ্রেণীবিভাগ জাতির সামনে তুলে ধরা বর্তমান প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য।

মু'মিনের সংজ্ঞা

ইসলামী জীবন বিধানে মু'মিন হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে ঈমান এনেছে। আর কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী 'ঈমান আনা' বিষয়টি হচ্ছে- لَا اِلَهَ اِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ الرَّسُوْلُ اللهِ কালেমাটি (কালেমায়ে তৈয়্যেবা) মুখে উচ্চারণ করা এবং ব্যাখ্যাসহ তার অর্থ অন্তরে বিশ্বাস করা।

কালেমাটির সরল অর্থ হচ্ছে-আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল। আর কালেমাটির অত্যন্ত সাধারণ ব্যাখ্যা হচ্ছে-মানুষের দুনিয়ার জীবনকে সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীলভাবে পরিচালনা করে পরকালীন অনন্ত জীবনের সফলতা অর্জনের জন্যে, সকল নির্ভুল তথ্য, বিধি-বিধান দেয়ার ও সকল প্রয়োজন পূরণের একমাত্র স্বাধীন সত্তা মহান আল্লাহ। ঐ সকল তথ্য ও বিধি-বিধান তিনি তাঁর নির্বাচিত ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সা.) কে কুরআন এবং সুন্নাহের মাধ্যমে জানিয়েছেন। মুহাম্মাদ (সা.) ঐ সকল বিষয় যেভাবে বাস্তবায়ন করেছেন সেটিই হল তা বাস্তবায়নের একমাত্র নির্ভুল পদ্ধতি।

তাহলে 'ঈমান আনা' আমলটির দ্বারা বুঝায়, কালেমা তাইয়্যেবাটি মুখে উচ্চারণ করা এবং কালেমাটির উপরোক্ত অর্থ ও ব্যাখ্যা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা। আর তাই মু'মিন হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে কালেমা তৈয়্যেবার উপরোক্ত অর্থ ও ব্যাখ্যা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে এবং মুখে ঘোষণার মাধ্যমে মানুষকে তা জানিয়ে দেয়। এখানে অন্তরের বিশ্বাসটিই মূল। আর সেটিই আল্লাহর দেখার বিষয়। মুখের ঘোষণাটি হল অন্য মানুষের জানা বা বুঝার জন্যে যে ব্যক্তিটি ঈমান আনার দাবি করছে বা ঘোষণা দিচ্ছে- যেন তাকে আইনগতভাবে মু'মিন ধরে নেয়া এবং সে অনুযায়ী তার সঙ্গে ব্যবহার করা যায়।

আমলে সালেহের সংজ্ঞা

ইসলামের করণীয় কাজ করা এবং নিষিদ্ধ কাজ হতে দূরে থাকাকে আমলে সালেহ (সৎকাজ) বা সংক্ষেপে আমল বলে। আর মানুষের জীবনকে সত্যিকারভাবে সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীলভাবে পরিচালনা করার জন্যে করণীয় ও নিষিদ্ধ সকল কাজই ইসলামে আমলে সালেহের অন্তর্ভুক্ত।

মৌলিকত্ব বা গুরুত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে আমলে সালেহের শ্রেণীবিভাগ

মৌলিকত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে আমলে সালেহকে (ইসলামের করণীয় বা নিষিদ্ধ বিষয়গুলোকে) তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ক. **প্রথম স্তরের মৌলিক:** এ বিষয়গুলো হচ্ছে সেগুলো যার একটিও পালন না করলে একজন মু'মিনের পুরো জীবন সরাসরি ব্যর্থ হবে। এ বিভাগের বিষয়গুলোর সবক'টি আল-কুরআনে উল্লেখ আছে।

খ. **দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক:** এ হচ্ছে প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির সেই নিয়ম-কানুন বা আরকান-আহকামগুলো যার একটিও বাদ গেলে প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়টি ব্যর্থ হবে। আর তাই পরোক্ষভাবে মু'মিনের পুরো জীবন ব্যর্থ হবে। এর কিছু আছে কুরআনে আর সব আছে সুন্নায়।

গ. **অমৌলিক:** এগুলো হচ্ছে সেই বিষয় যার সব ক'টিও বাদ গেলে কোন মু'মিনের জীবন ব্যর্থ হবে না। তবে তাতে কিছু অপূর্ণতা বা খুঁত থাকবে। এর দু-চারটি আছে কুরআনে আর সব আছে সুন্নায়।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী ইসলামের মৌলিক বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ হাদীস কোনগুলো তা জানা ও বোঝার সহজতম উপায়' নামক বইটিতে।

ঈমান না থাকলে আমলে সালেহ্ কবুল না হওয়ায় কারণ

অহরহ এ প্রশ্নটি শুনা যায় বা মানুষের মনে উদয় হয় যে, একজন অমুসলিম (ইহুদী, খ্রিষ্টান বৌদ্ধ, হিন্দু ইত্যাদি), যে মানুষের কল্যাণের জন্যে কিছু বা অনেক ভাল কাজ করছে, সে বেহেশতে কেন যাবে না বা সে বেহেশত কেন পাবে না? প্রশ্নটির উত্তর জানা ও বুঝা তেমন কঠিন নয়। আর তা জানা ও বুঝা সহজ হবে, ঈমান আমলে সালেহ্ কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত হওয়ার কারণটি জানতে ও বুঝতে পারলে। বিষয়টি প্রত্যেক ঈমানদারের নিজের মনের প্রশান্তি ও অপরের প্রশ্নের সঠিক ও যুক্তিসঙ্গত উত্তর দেয়ার জন্যে ভালভাবে জানা ও বুঝা দরকার।

আল্লাহ চান সকল মানুষ তাদের দুনিয়ার জীবন সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীলভাবে পরিচালনা করে আখিরাতের অনন্ত সুখ-শান্তি লাভ করুক। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ জানেন পুরুষ, নারী, ধনী, গরিব, উচ্চশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত, কালো, সাদা এবং বিভিন্ন বংশ, গোত্র, জাতি বা দেশে জন্মগ্রহণ করা সকল মানুষের জীবনের সকল (ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, পারলৌকিক, আন্তর্জাতিক ইত্যাদি) দিকে সমানভাবে কল্যাণকর, চিরসত্য তথ্য ও বিধি-বিধান দেয়ার জন্যে যে জ্ঞান ও গুণ থাকা দরকার তা মানুষের নেই বা তা মানুষকে দেয়া হয়নি।

মহান আল্লাহ্ এটিও জানেন মানুষ যদি তাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে জীবনের সকল দিকের তথ্য ও বিধি-বিধান তৈরী করে তবে তাতে অনেক মৌলিক ভুল থাকবে। ঐ ভুল তথ্য ও বিধি-বিধান অনুযায়ী জীবনের বিভিন্ন দিক পরিচালনা করলে জীবন সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল না হয়ে পুরোপুরি ব্যর্থ হবে। কারণ কোন বিষয়ে মৌলিক একটিও ভুল থাকলে ঐ বিষয়টি পুরোপুরি (১০০%) ব্যর্থ হয়, এটি আল্লাহর নিজের তৈরী একটি প্রাকৃতিক আইন (Nanural law)। এ জন্যেই মহান আল্লাহ্ ঈমান আনাকে আমল কবুল হওয়ার পূর্ব শর্ত করেছেন। কারণ যারা ঈমান আনবে তারা জীবনের সকল দিকের তথ্য ও বিধি-বিধান গ্রহণ করবে নির্ভুল উৎস কুরআন ও সুন্নাহ্ থেকে এবং তারা ঐ তথ্য ও বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করবে রাসূল (সা.)-এর দেখিয়ে দেয়া নির্ভুল পদ্ধতি অনুযায়ী। ফলে তাদের জীবন সকল দিক দিয়ে সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল হবে।

আর যারা ঈমান আনবে না তারা জীবনের সকল দিকের তথ্য ও বিধি-বিধান গ্রহণ করবে এমন সব উৎস থেকে যাতে অনেক মৌলিক ভুল থাকবে। ফলে তাদের জীবন সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল না হয়ে পুরোপুরি ব্যর্থ হবে।

তবে মহান আল্লাহ ঈমান আনার ব্যাপারে কাউকে জোর-জবরদস্তি করতে নিষেধ করেছেন। কারণ জোর-জবরদস্তি করে কাউকে মন দিয়ে বা নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করানো যায় না। ইসলাম চায় প্রত্যেক ঈমানদার মনের থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে ইসলামের সকল আমলে সালেহ বাস্তবায়ন করুক। তাই ঈমান আনার জন্যে উদ্বুদ্ধ করার ইসলাম সম্মত পদ্ধতি হল আল্লাহর অস্তিত্ব, একত্ব, জ্ঞান, ক্ষমতা, যোগ্যতা, মানুষের জন্যে কল্যাণ কামনাকারী সত্তা হওয়া, কুরআন আল্লাহর কিতাব তথা নির্ভুল কিতাব হওয়া, মুহাম্মদ স. আল্লাহর রাসূল হওয়া, ইসলামের সকল বিধি-বিধান মানুষের দুনিয়ার জীবনের জন্যে কল্যাণকর হওয়া ইত্যাদি বিষয় যুক্তির মাধ্যমে একজনের সামনে উপস্থাপন করা। যাতে বিষয়গুলো সন্তুষ্টচিত্তে সে মেনে নিতে পারে, মনের প্রশান্তি সহকারে তা আমল করতে পারে এবং দৃঢ়পদে তার উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

যে সকল শর্ত পূরণ করার উপর আমলে সালেহ পালন করে সওয়াব বা নেকী হওয়া নির্ভর করে

ইসলামে মু'মিনের আমলে সালেহ পালন করলেই সওয়াব বা নেকী হয় না। নিম্নের শর্তগুলো পূরণ করে পালন করলেই শুধু সওয়াব বা নেকী হয়-

ক. আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সর্বক্ষণ সামনে রাখা,

খ. কাজটির ব্যাপারে আল্লাহ বা রাসূল (সা.)-এর বলে দেয়া উদ্দেশ্য জানা এবং সে উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে বা হবে কিনা, কাজটি বা তার অংশবিশেষ করার সময় তা সর্বক্ষণ খেয়াল রাখা,

গ. উদ্দেশ্যটি বাদে কোন কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্য সকল বিষয় হচ্ছে পাথেয়। অর্থাৎ ঐ উদ্দেশ্য সাধনের উপায়। তাই পাথেয়মূলক কাজগুলোকে এমনভাবে পালন করতে হবে যে, তা যেন কাজটির উদ্দেশ্য সাধনের ব্যাপারে কোন না কোনভাবে সহায়ক হয়,

ঘ. কাজটি আল্লাহর জানিয়ে দেয়া ও রাসূল (সা.)-এর দেখিয়ে দেয়া পদ্ধতি (আরকান-আহকাম) অনুসরণ করে পালন করা,

ঙ. ব্যাপক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে-

- ❑ মৌলিক বিষয়ের একটিও বাদ না দেয়া,
- ❑ গুরুত্ব অনুযায়ী কাজগুলো আগে বা পরে করা।

চ. আনুষ্ঠানিক কাজের ব্যাপারে-

- ❑ প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো বুঝে বুঝে মনে-প্রাণে গ্রহণ করা,
- ❑ সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে বাস্তবে প্রয়োগ করা।

উল্লিখিত শর্তের একটিও বাদ গেলে কোন কাজ আল্লাহর নিকট কবুল হবে না। অর্থাৎ তাতে সওয়াব হবে না। আর কাজের ধরন অনুযায়ী প্রযোজ্য শর্তগুলো পূরণ করে জীবনের যেকোন কাজ করলে তাতে সওয়াব হবে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'কুরআন হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী ইবাদাত কবুলের শর্তসমূহ' নামক বইটিতে।

গুণাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ

ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি ইসলামে আমলে সালেহ পালন করলেই সওয়াব হয় না। কয়েকটি শর্ত পূরণ করে তা পালন করলে সওয়াব হয়। তেমনি ইসলামে আমলে সালেহ ছেড়ে দিলেই গুনাহ হয় না। কয়েকটি শর্ত পূরণ না করে ছেড়ে দিলেই শুধু তা হয়। শর্তগুলো হচ্ছে-

১. ওজর বা বাধ্য-বাধকতা (Excuse)

২. অনুশোচনা (Repentance)

৩. উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা (Efforts to overcone)

এ শর্ত তিনটি যে আমলটি ছাড়া হচ্ছে তার সমান গুরুত্ব বা পরিমাণের হলে আমলটি ছাড়ায় কোন গুনাহ হয় না।

তাই ইসলামে গুনাহের সংজ্ঞা হল-আমলে সালেহ সমান গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ব্যতীত ছেড়ে দেয়া। অর্থাৎ ইসলামে সমান গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ব্যতীত করণীয় কাজ ছেড়ে দেয়া এবং নিষিদ্ধ কাজ করাকে গুনাহ বলা হয়।

গুনাহের শ্রেণীবিভাগ

ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টার গুরুত্ব বা পরিমাণের উপর ভিত্তি করে ইসলামে গুনাহ মূলত ৪ (চার) ভাগে বিভক্ত। যথা-

১. ছগীরা গুনাহ

২. মধ্যম গুনাহ (না ছগীরা না কবীরা)

৩. সাধারণ কবীরা গুনাহ (কুফরী ব্যতীত অন্য কবীরা গুনাহ)

৪. কুফরীর গুনাহ (কুফরী ধরণের কবীরা গুনাহ)

আর শর্ত তিনটি পূরণের ধরনের উপর নির্ভর করে আমলে সালেহ ছাড়ায় গুনাহ হবে কিনা বা হলে কী ধরনের গুনাহ হবে, তা নির্ধারিত হয় নিম্নোক্ত ভাবে-

১. সমান গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ বড়-ছোট যে কোন আমলে সালেহ ছাড়লে কোন গুনাহ হবে না।

২. কোন ধরনের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ব্যতীত তথা ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশীমনে বড়-ছোট যে কোন আমলে সালেহ ছাড়লে কুফরীর গুনাহ হবে।

৩. প্রায় সমান গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ বড় আমল ছাড়লে ছগীরা (ছোট) গুনাহ হবে।

৪. প্রায় না থাকার মত ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ বড় আমল ছাড়লে সাধারণ কবীরা গুনাহ হবে।

৫. মধ্যম-গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ বড় আমল ছাড়লে মধ্যম (না কবীরা না ছগীরা) গুনাহ হবে।

বড়, মৌলিক বা কবীরা আমলে সালেহ ছাড়ার পর যে সকল ধরনের গুনাহ হওয়া সম্ভব

এ পর্যন্তকার আলোচনার পর সহজেই বলা যায় যে, ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার ধরনের ভিত্তিতে বড় আমল ছেড়ে দেয়ার পর নিম্নোক্ত ধরনের গুনাহসমূহ হওয়া সম্ভব-

১. প্রায় সমান গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ ছাড়লে ছগীরা গুনাহ হবে।

২. মধ্যম ধরনের গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ ছাড়লে মধ্যম (না ছগীরা না কবীরা) গুনাহ হবে।

৩. প্রায় না থাকার মত গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ ছাড়লে সাধারণ কবীরা গুনাহ হবে।

৪. কোন ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ছাড়া ছাড়লে কুফরীর গুনাহ হবে।

ছোট, অমৌলিক বা ছগীরা আমলে সালেহ ছাড়ার পর যে সকল ধরনের গুনাহ্ হওয়া সম্ভব

১. কোন ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ব্যতীত অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে, খুশীমনে ছেড়ে দিলে কুফরীর গুনাহ হবে।

২. অল্প বা কিছু না কিছু গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ ছাড়লে কোন গুনাহ্ হবে না।

বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। 'কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ' নামের বইটিতে।

মু'মিনের মূল শ্রেণীবিভাগ

সওয়াব ও গুনাহের উপস্থিতির ভিত্তিতে মু'মিনকে মূলত দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ক. নেক্‌কার মু'মিন

খ. গুনাহ্‌গার মুমিন

নেক্‌কার মু'মিন হল সেই মু'মিন যে জীবনে গুনাহ্ করেনি বা যার জীবনে গুনাহ্ উপস্থিত নাই।

গুনাহ্‌গার মু'মিন হল সে যার জীবনে গুনাহ্ উপস্থিত আছে। এই গুনাহ্‌গার মু'মিনকে কুরআন ও হাদীসে ফাসিক হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে। তবে কুরআন ও হাদীসে কাফির ব্যক্তিকেও ফাসিক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

নেক্‌কার মু'মিনের শ্রেণীবিভাগ

ইসলামী জীবনবিধানে নেক্‌কার মু'মিনদের আমলে সালেহ্ পালন বা ছাড়ার ধরনের উপর ভিত্তি করে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা-

ক. মুসলিম

মুসলিম বলে গণ্য হওয়ার উপায় দুটি-

১. আমল কবুল হওয়ার শর্তগুলো পূরণের সময় নিষ্ঠার দিক দিয়ে সর্বনিম্ন স্তরে থেকে সকল আমলে সালেহ্ পালন করা।

২. আমল কবুল হওয়ার শর্তগুলো পূরণের সময় নিষ্ঠার দিকে সর্বনিম্ন স্তরে থেকে এক বা একাধিক আমলে সালেহ্ পালন করা এবং সমান গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ এক বা একাধিক আমলে সালেহ্ ছেড়ে দেয়া।

মুসলিম হচ্ছে নেককার মু'মিনের সর্বনিম্ন স্তর। তাই আল-কুরআন বলেছে-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَتِه وَ لاَ تَمُوْتُنَّ الاَّ وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ.

অর্থঃ হে মু'মিনগণ, আল্লাহকে সঠিকভাবে ভয় কর এবং মুসলমান না হয়ে অবশ্যই মৃত্যুবরণ কর না। (আলে-ইমরান : ১০২)

ব্যাখ্যাঃ মহান আল্লাহ এখানে মু'মিনদের মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করতে নিষেধ করেছেন। কারণ, মুসলমান হচ্ছে সর্বনিম্ন স্তরের নেককার মু'মিন। তাই এর চেয়ে নিম্ন স্তরের মু'মিন হয়ে মৃত্যুবরণ করলে পরকালে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে বলে মহান আল্লাহ্ এখানে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন।

মুত্তাকী

মুত্তাকী বলে গণ্য হওয়ার উপায় দুটি। যথা-

১. আল্লাহর ভয়ে মুসলিমের চেয়ে অধিক নিষ্ঠা ও নিখুঁতভাবে ইবাদাত কবুলের শর্তসমূহ পূরণ করে সকল আমলে সালেহ পালন করা।
২. আল্লাহর ভয়ে মুসলিমের চেয়ে অধিক নিষ্ঠা ও নিখুঁতভাবে ইবাদাত কবুলের শর্তসমূহ পূরণ করে বেশী সংখ্যক আমলে সালেহ পালন করা এবং মুসলিমের চেয়ে কম সংখ্যক আমলে সালেহ সমান গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার চেষ্টাসহ ছেড়ে দেয়া।

মুহসিন

মুহসিন হওয়ার উপায়ও হল দুটি। যথা-

১. আল্লাহর ভালবাসায় মুত্তাকীর চেয়ে অধিক নিষ্ঠা ও নিখুঁতভাবে ইবাদাত কবুলের সকল শর্ত পূরণ করে সকল আমলে সালেহ পালন করা।
২. আল্লাহর ভালবাসায় মুত্তাকীর চেয়ে অধিক নিষ্ঠা ও নিখুঁতভাবে ইবাদাত কবুলের শর্তগুলো পূরণ করে এক বা একাধিক আমলে সালেহ পালন করা এবং মুত্তাকীর চেয়ে কম সংখ্যক আমল সমান গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ ছেড়ে দেয়া।

গুনাহগার মু'মিনের শ্রেণীবিভাগ

ইসলামে গুনাহগার মু'মিন ৪ (চার) শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা-

১. কুফরীর গুনাহগার মু'মিন
২. সাধারণ (কুফরী ব্যতীত অন্য) কবীরা গুনাহগার মু'মিন
৩. মধ্যম (না কবীরা না ছগীরা) গুনাহগার মু'মিন
৪. ছগীরা গুনাগার মু'মিন।

বিভিন্ন শ্রেণীর গুনাহগার বলে গণ্য হওয়ার কারণ

১. কুফরীর গুনাহগার মু'মিন

ছোট বা বড় যেকোন আমলে সালেহ্ কোন ধরনের ওজর অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ব্যতীত তথা ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশীমনে ছেড়ে দিলে বা ঘৃণা করলে একজন মু'মিন কুফরীর গুনাহগার বলে গণ্য হবে বা হয়।

২. সাধারণ (কুফরী ব্যতীত অন্য) কবীরা গুনাহগার মু'মিন

কবীরা (বড়) আমলে সালেহ্ প্রায় না থাকার মত বা অল্প গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ্ ছাড়লে একজন মু'মিন সাধারণ কবীরা গুনাহগার মু'মিন বলে গণ্য হবে বা হয়।

৩. মধ্যম (না কবীরা না ছগীরা) গুনাহগার মু'মিন

কবীরা আমলে সালেহ্ মধ্যম (৫০%) গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা বা উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ্ ছাড়লে একজন মু'মিন মধ্যম গুনাহগার বলে গণ্য হবে বা হয়।

৪. ছগীরা গুনাহগার মু'মিন

বড় আমলে সালেহ্ প্রায় সমান তথা প্রচণ্ড গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ ছাড়লে একজন মু'মিন ছগীরা (ছোট) গুনাহগার বলে গণ্য হবে বা হয়।

ছোট আমল অল্প বা কিছু গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ ছাড়লে কোন গুনাহ হয় না। কারণ ঐ অল্প ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ছোট আমলের গুরুত্বের সমান হয়ে যায়। আর সমান গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ আমলে সালেহ ছাড়লে তথা করণীয় কাজ ছাড়লে বা নিষিদ্ধ কাজ করলে কোন গুনাহ হয় না।

❑❑ বেশীরভাগ ক্ষেত্রে উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাটি হবে নিজ দেশে ইসলামকে বিজয়ী তথা শাসন ক্ষমতায় বসানোর চেষ্টা করা। কারণ একজন মু'মিনকে যে সকল কারণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনৈসলামিক কাজ পালন করতে বা সহ্য করতে হয় তার মধ্যে সবচেয়ে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অবস্থাটি হল নিজ দেশে ইসলাম বিজয়ী না থাকা। এ বিষয়টি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে পূর্বোল্লিখিত 'কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ' নামক বইটিতে।

কাফিরের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ

সংজ্ঞা

যে ব্যক্তি অন্তরে ঈমান আনেনি তথা কালেমা তায়্যেবার ব্যাখ্যাসহ অর্থটি অন্তরে বিশ্বাস করেনি তাকে কাফির বলে।

শ্রেণী বিভাগ

কাফির প্রধানত দুভাগে বিভক্ত। যথা-

১. প্রকাশ্য কাফির,
২. গোপন কাফির।

১. প্রকাশ্য কাফির

প্রকাশ্য কাফির হল তারা যারা প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয় যে তারা কালেমা তাইয়্যেবার ব্যাখ্যাসহ অর্থটি বিশ্বাস করে না। প্রকাশ্য কাফিররা আবার দুভাগে বিভক্ত। যথা-

ক. সাধারণ কাফির
খ. তাগুত কাফির।

ক. সাধারণ কাফির

এরা নিজেরা ঈমান আনে না কিন্তু অপরে ইসলাম অনুযায়ী জীবন-যাপন করল কি করল না সে বিষয়ে মাথা ঘামায় না। ইসলামের ক্ষতি করার দিক দিয়ে এরা সর্বনিম্ন পর্যায়ের।

খ. তাগুত কাফির

এরা নিজেরা ঈমান আনে না এবং অপরে যাতে ইসলাম বিরুদ্ধ কাজ করতে বাধ্য হয় বা ইসলাম সিদ্ধ কাজ করতে না পারে, সে ব্যাপারে ব্যবস্থা বা পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ইসলামের ক্ষতি করার দিক দিয়ে এদের অবস্থান মধ্যম।

২. গোপন কাফির

এ ধরনের কাফির হচ্ছে তারা যারা মুখে বা প্রকাশ্যে ঈমান আনার ঘোষণা দেয় কিন্তু অন্তরে ঈমান আনে না এবং প্রকাশ্যে মানুষ দেখানোর জন্যে কিছু আমলে সালেহ পালন করে কিন্তু গোপনে ঈমানের দাবি বিরুদ্ধ কাজ করে বা কথা বলে।

ইসলামে এ ধরনের কাফিরদের মুনাফিক বলে। আর ক্ষতির দিক দিয়ে এরাই বেশি মারাত্মক। কারণ, এরা মুসলিম সমাজের মধ্যে থেকে গোপনে ক্ষতি করে। তাই কুরআন ও সুন্নাহ মুনাফিক শ্রেণীর কাফিরদের সর্বনিম্ন স্তরের জাহান্নামে যাওয়ার স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছে।

মুনাফিক বলে গণ্য হওয়ার কারণ তথা মুনাফিকদের শনাক্ত করার উপায়

প্রকাশ্যে ঈমান তথা কালেমা তাইয়্যেবা অস্বীকারকারীরা কাফির হবে, তা বুঝা সহজ এবং এ ধরনের কাফিরকে শনাক্ত করাও সহজ। কিন্তু গোপন কাফির তথা মুনাফিক কী কী কারণে হয় বা হবে তথা মুনাফিকদের শনাক্ত করার উপায়সমূহ বুঝা একটু কঠিন হতে পারে। তাই চলুন এখন এ বিষয়টি বিবেক-বুদ্ধি, কুরআন ও হাদীসের আলোকে পর্যালোচনা করা যাক-

বিবেক-বুদ্ধি

কোন ব্যক্তি যদি একটি বিষয় মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে তবে তার বাস্তব কাজে অবশ্যই তা প্রকাশ পাবে। এটি অত্যন্ত সহজ বোধগম্য একটি কথা। তাই যদি দেখা যায়, এক ব্যক্তি জানা থাকার পরও ইচ্ছাকৃতভাবে, খুশি মনে অর্থাৎ কোন ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ব্যতীত একটি বিশ্বাস বিরুদ্ধ কাজ করছে, তবে বুঝতে হবে মুখে বা প্রকাশ্যে ঘোষণা দিলেও অন্তরে সে ঐ বিশ্বাসে বিশ্বাসী নয়। আর জানার পরও খুশি মনে কোন করণীয় কাজ না করা বা নিষিদ্ধ কাজ করার অন্য অর্থ হচ্ছে ঐ করণীয় কাজটিকে ঘৃণা করা বা নিষিদ্ধ কাজটিকে পছন্দ করা।

তাই বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী সহজে বলা ও বুঝা যায়, মুখে বা প্রকাশ্যে ঈমানের ঘোষণা দিলেও কেউ যদি জানার পরও ইচ্ছা করে, খুশি মনে তথা ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ব্যতীত ঈমানের দাবি বিরুদ্ধ একটিও কাজ করে, তবে সে মুনাফিক বিভাগের কাফির হিসেবে গণ্য হবে। তবে ওজর, অনুশোচনা ও বাঁচার চেষ্টা থাকলে গুনাহগার মু'মিন হিসেবে গণ্য হবে।

আল-কুরআন

তথ্য-১

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَّقُوْلُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থ: মানুষের মধ্যে এমন অনেকে আছে যারা (মুখে) বলে, আমরা ঈমান এনেছি কিন্তু (প্রকৃতপক্ষে) তারা ঈমানদার বা মু'মিন নয়। (বাকারা : ৮)

ব্যাখ্যা: এখানে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, মানুষের মধ্যে এমন অনেকেই আছে বা থাকবে, যারা মুখে ঈমানের দাবি করলেও অন্তরে ঈমান আনেনি। অর্থাৎ তারা মুনাফিক। তবে এ ধরনের ব্যক্তি আসলে অন্তরে ঈমান এনেছে কিনা তা কিভাবে প্রমাণিত হবে বা বুঝা যাবে, সে ব্যাপারে এখানে কিছু বলা হয়নি।

তথ্য-২

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوْا أَنْ يَّقُولُوْا آمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُوْنَ. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِيْنَ.

অর্থ: মানুষেরা কি মনে করেছে যে, ঈমান এনেছি-এ কথাটি বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে এবং তাদের পরীক্ষা করা হবে না? অথচ তাদের পূর্বে যারা দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছে, তাদের সকলকেই আমি (আমলের মাধ্যমে) পরীক্ষা করেছি। আল্লাহকে তো অবশ্যই (আমলের মাধ্যমে) পরীক্ষা করে জেনে নিতে হবে, কে (ঈমানের ব্যাপারে) সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী। (আন কাবুত : ২)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ এখানে উদাহরণের মাধ্যমে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, কালেমা তাইয়্যেবা মুখে উচ্চারণ করার মাধ্যমে ঈমানের দাবিদার সকলকে কাজের মাধ্যমে পরীক্ষা দিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে, সে ঈমান আনার ব্যাপারে সত্যবাদী। যার সকল কাজ ঈমানের দাবির সঙ্গে সঙ্গতিশীল হবে, সে পরীক্ষায় পাস করবে অর্থাৎ সে অন্তরেও ঈমান এনেছে বলে প্রমাণিত হবে। আর যার কাজ ঈমানের দাবির সঙ্গে সঙ্গতিশীল হবে না বা বিপরীত হবে অর্থাৎ সে জানার পরও ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশী মনে বিরুদ্ধ কাজ করবে সে পরীক্ষায় ফেল করেছে বলে ধরা হবে। অর্থাৎ প্রমাণিত হবে, মুখে ঈমান আনার দাবি করলেও অন্তরে সে ঈমান আনেনি। অর্থাৎ সে মুনাফিক।

তথ্য-৩

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَجوَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيللاوَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِط وَأَقَامَ الصَّلَوةَ وَآتَى الزَّكَوةَجوَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواجوَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُواطوَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ.

অর্থঃ তোমরা মুখ পূর্ব দিক করলে না পশ্চিম দিক করলে, এটি কোন সওয়াবের (কল্যাণের) কাজ নয়। বরং সওয়াবের কাজ সেই করে যে আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীদের বিশ্বাস করে বা মান্য করে। আর শুধু আল্লাহর ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ধন-সম্পদ আত্মীয়-স্বজন, মিসকিন, পথিক, সাহায্য প্রার্থী ও ক্রীতদাস মুক্তির জন্যে ব্যয় করে এবং নামাজ কায়েম, জাকাত আদায় ও ওয়াদা করলে পূরণ করে। দরিদ্র্যতা, বিপদ-আপদ ও হক-বাতিলের দ্বন্দ্বের সময় হকের পক্ষে ধৈর্য ধারণ করে। এরাই (ঈমানের ব্যাপারে) সত্যবাদী এবং এরাই মুত্তাকী।(বাকারা : ১৭৭)

ব্যাখ্যাঃ আয়াতে-কারীমায় মহান আল্লাহ প্রথমে বলেছেন, নামাজের সময় মুখ পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ফেরানো অর্থাৎ শুধু অনুষ্ঠান করার মধ্যে কোন সওয়াব নেই। এরপর তিনি যে সকল কাজে সওয়াব আছে, তার কয়েকটির নাম উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হচ্ছে-

ক. আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীদের প্রতি ঈমান আনা,
খ. শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে ধন-সম্পদ গরিব আত্মীয়-স্বজন, মিসকিন, পথিক, সাহায্যপ্রার্থী ও ক্রীতদাস মুক্তির জন্যে ব্যয় করা,
গ. নামাজ কায়েম করা,
ঘ. জাকাত আদায় করা,
ঙ. ওয়াদা করলে তা পূরণ করা,
চ. দারিদ্র্য, বিপদ-আপদ ও হক-বাতিলের দ্বন্দ্বের সময় হকের পক্ষে ধৈর্য ধারণ করা অর্থাৎ দৃঢ় পদে দাঁড়িয়ে থাকা।

আয়াতখানি শেষে আল্লাহ বলেছেন, যে ব্যক্তিরা খ, গ, ঘ, ঙ, চ বিভাগের কাজগুলি করে, তারাই শুধু ঈমান আনা দাবির ব্যাপারে সত্যবাদী এবং প্রকৃত মুত্তাকী। অর্থাৎ মহান আল্লাহ এই আয়াতে-কারীমার মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন, যে সকল কাজ তিনি পালন করতে আদেশ দিয়েছেন বা নিষেধ করেছেন এবং ঐ কাজগুলো যেভাবে তিনি পালন করতে বলেছেন সেভাবেই যারা তা পালন করবে শুধু তারাই ঈমানের দাবির ব্যাপারে সত্যবাদী ও প্রকৃত মুত্তাকী।

আর জানার পরও যারা তা করে না অর্থাৎ জানার পরও ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ব্যতীত তথা খুশি মনে তা ছেড়ে দেয়, তারা ঈমানদার ও মুত্তাকী নয়। অর্থাৎ এক ব্যক্তি প্রকৃত ঈমানদার ও মুত্তাকী কিনা, তা তার কাজের মাধ্যমে প্রমাণিত হবে। যদি সে তা প্রমাণ করতে না পারে তবে বুঝতে হবে, মুখে দাবি করলেও সে অন্তরে ঈমান আনেনি। অর্থাৎ সে মুনাফিক।

তথ্য-৪

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُواط وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُواج

অর্থ: আল্লাহর নামে কসম খায় যে তারা (সে কথা) বলেনি অথচ নিঃসন্দেহে তারা কুফরী কথা বলেছে এবং ইসলাম গ্রহণের পর কুফরী অবলম্বন করেছে। আর তারা সে সব কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করেছিল, যা তারা করতে পারেনি। (তওবা : ৭৪)

ব্যাখ্যা: এখানে ইসলাম গ্রহণের পর তথা ঈমান আনার পর (জানা থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে, খুশি মনে) কুফরী কথা তথা ইসলাম বিরুদ্ধ কথা বলাকে মুনাফেকী তথা মুনাফিক বলে গণ্য হওয়ার বিষয় বলে মহান আল্লাহ উল্লেখ করেছেন।

তথ্য-৫

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ج وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ لا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ.

অর্থ: তারা যখন ঈমানদারদের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন বলে আমরা ঈমান এনেছি। কিন্তু যখন তাদের শয়তান বন্ধুদের সঙ্গে নিরিবিলিতে মিলিত হয়, তখন তারা বলে আমরা তোমাদের সঙ্গেই আছি। আমরা তো (মুসলমানদের সাথে) ঠাট্টা-উপহাস করি মাত্র। (বাকারা : ১৪)

ব্যাখ্যা: এখান থেকে বুঝা যায়, মুনাফিকদের একটি দোষ এই যে, তারা মুসলমান তথা ইসলাম নিয়ে ঠাট্টা-উপহাস করে। অর্থাৎ যদি দেখা যায়, ঈমানের দাবিদার কেউ জানা থাকার পরও ইচ্ছাকৃতভাবে, খুশি মনে ইসলামের কোন বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-উপহাস করছে, তবে বুঝতে হবে সে মু'মিন নয়, মুনাফিক।

তথ্য-৬

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ج

অর্থ: (এটা) এ কারণে যে তারা, যে সকল ব্যক্তি আল্লাহর নাযিল করা বিষয়কে অপছন্দ বা ঘৃণা করে তাদের বলে, কিছু কিছু বিষয়ে আমরা তোমাদের অনুসরণ করব। (মুহাম্মদ : ২৬)

ব্যাখ্যা: এই আয়াতে-কারীমার আগের আয়াতখানিতে (২৫ নং) আল্লাহ ঐ ধরনের আচরণ অর্থাৎ আল্লাহর নাযিল করা বিষয়ের কিছু অনুসরণ করা আর কিছু অনুসরণ না করাকে, শয়তানের পছন্দনীয় আচরণ বলে উল্লেখ করেছেন। আর পরের দু'টি (২৭ ও ২৮ নং) আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, যারা ইসলামের ব্যাপারে ঐ রকম আচরণ করবে, তাদের সকল আমল বিফল করে দিবেন এবং তাদের শাস্তি পেতে হবে।

এখান থেকে তাই পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়, ঈমান আনার দাবি করলেও যারা ইসলামের কিছু বিষয় অনুসরণ করবে আর কিছু বিষয় জানার পরও ইচ্ছাকৃতভাবে খুশি মনে অমান্য করবে বা অনুসরণ করবে না, তারা আল্লাহর নিকট মুনাফিক বলে গণ্য হবে। আর তাই তাদের শাস্তি পেতে হবে।

আল-হাদীস

তথ্য-১

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَ لاَ اِلى أَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَّنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তোমাদের বাহ্যিক অবস্থা ও ধন-সম্পদের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না, বরং তিনি দেখেন তোমাদের অন্তর ও কাজ। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানিতে রাসূল (সা.) পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন মহান আল্লাহ মানুষের বাহ্যিক চেহারা-ছবি, পোশাক-পরিচ্ছদের ধরন, ধন-সম্পদ ইত্যাদি দেখেন না। তিনি দেখেন অন্তর অর্থাৎ মনে কালেমা তাইয়্যেবা বিশ্বাসের দৃঢ়তা এবং তার সঙ্গে সঙ্গতিশীল বাস্তব কাজ বা আমল।

তথ্য-২

عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ (ص) لَيْسَ الاِيْمَانُ بِالتَّمَنِّىْ وَلاَ بِالتَّحَلِّىْ وَلَكِنَّهُ مَا وَقَرَ فِى الْقَلْبِ وَ صَدَّقَهُ الْعَمَلُ.

অর্থ: আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) বলেছেন, মু'মিন হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা এবং মু'মিনের মত অবয়ব বানিয়ে নিলেই ঈমান

সৃষ্টি হয় না। বরং তা (সেই সুদৃঢ় বিশ্বাস) যা হৃদয়ের মাঝে পূর্ণরূপে বদ্ধমূল হয়ে যায় এবং যাবতীয় কাজ তার সত্যতার সাক্ষ্য বহন করে।

ব্যাখ্যা: হাদীসখানির মাধ্যমে রাসূল (সা.) স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, ঈমান শুধু কালেমা তাইয়্যেবা মুখে উচ্চারণ করা ও চেহারা-ছবি বা পোশাক-পরিচ্ছদের কিছু পরিবর্তনের নাম নয় বরং তা হচ্ছে অন্তরে কলেমা তাইয়্যেবার পুরো অর্থ ও ব্যাখ্যাকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা এবং বাস্তব আমলের মাধ্যমে সে বিশ্বাসের প্রমাণ দেখানো।

তথ্য-৩

وَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ص) لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِّمَا جِئْتُ بِهِ.

অর্থ: আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের প্রবৃত্তিকে (খেয়াল-খুশিকে) আমার আনীত বিষয়ের ধানের অধীন না করে। (মেশকাত)

ব্যাখ্যা: এ হাদীসখানিতেও রাসূল (সা.) বলেছেন, মু'মিন হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে হলে একজনের সকল কর্মকাণ্ডকে কুরআন ও সুন্নাহের বিধানের অধীন আনতে হবে। অর্থাৎ বাস্তব আমলের মাধ্যমে ঈমানের দাবির সত্যতা প্রমাণ করতে হবে।

তথ্য-৪

وَعَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ فَمَا خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ (ص) اِلاَّ قَالَ لاَ اِيْمَانَ لِمَنْ لاَ اَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ.

অর্থ: আনাস (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) আমাদের এমন নসিহত খুব কমই করেছেন, যার ভিতর তিনি এ কথা বলেননি যে, 'খিয়ানতকারীর ঈমান নেই এবং ওয়াদা ভঙ্গকারীর দীন নেই।' (বায়হাকী)

ব্যাখ্যা: খিয়ানাত করা ঈমানের দাবির বিরুদ্ধ একটি কাজ। তাই হাদীসখানিতে রাসূল (সা.) (জানা থাকার পরও ইচ্ছাকৃতভাবে) খিয়ানতকারীর ঈমান নেই অর্থাৎ তাকে মুনাফিক বলে ঘোষণা করেছেন।

তথ্য-৫

ক.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثَةٌ (زَادَ الْمُسْلِمٌ وَانْ صَامَ وَ صَلَّى وَزَعَمَ انَّهُ مُسْلِمٌ) إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, মুনাফিকের লক্ষণ তিনটি (মুসলিম শরীফে অতিরিক্তভাবে যোগ করা হয়েছে- সে যদি সালাত, সওম আদায় করে এবং নিজেকে মুসলিম বলে মনে করে তবুও) : সে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে এবং আমানত রাখলে খিয়ানত করে। (বুখারী, মুসলিম)

খ.

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

অর্থ: আবদুল্লাহ বিন আমর (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, চারটি স্বভাব যার মধ্যে পাওয়া যাবে, সে পুরোপুরি মুনাফিক। আর যার মধ্যে তার একটি পাওয়া যাবে, তার মধ্যে মুনাফিকির একটি স্বভাব অবশ্যই আছে, যদি (তওবা করে) সে তা পরিত্যাগ না করে। সে চারটি স্বভাব হচ্ছে-আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে, কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করার পর তা ভঙ্গ করে এবং যখন ঝগড়া-লড়াই করে তখন নৈতিকতা ও বিশ্বাসপরায়ণতার সীমা লংঘন করে। (বুখারী, মুসলিম)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা: হাদীস দু'খানিতে উল্লিখিত প্রত্যেকটি বিষয় ইসলামের একটি আমলে সালেহ। তাই হাদীস দু'খানির আলোকে নিশ্চয়তা দিয়েই বলা যায়, রাসূল (সা.) স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, যারা ঐ বিষয়গুলোসহ ইসলামের যে কোন একটি আমলে সালেহ জানা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশি মনে ত্যাগ করার পর তওবা করে নিজেকে শুধরিয়ে না নেবে, তারা কাফির বা মুনাফিক বলে গণ্য হবে।

তথ্য-৬

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ.

অর্থ: হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন : রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, ঈমানের সত্তরটিরও অধিক শাখা রয়েছে। তার শ্রেষ্ঠটি হল-'আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই-এই ঘোষণা দেয়া এবং নিম্নতমটি হল পথ হতে কষ্টদায়ক জিনিস অপসারিত করা এবং লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি শাখা। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানি থেকে বুঝা যায়, প্রতিটি আমলে সালেহ হচ্ছে ঈমানের শাখা বা অঙ্গ। তাই কেউ যদি কালেমা তাইয়্যেবা মুখে ঘোষণা দেয়ার পর যে কোন একটি আমলে সালেহ জানা থাকার পরও ইচ্ছাকৃতভাবে, খুশি মনে ত্যাগ করে তবে সে ঈমানের একটি অংশ অস্বীকার করল। অর্থাৎ এ জন্যে সে মুনাফিকরূপে গণ্য হবে।

মুনাফিক বলে গণ্য হওয়ার তথা মুনাফিরদের শনাক্ত করার উপায়সমূহের সারসংক্ষেপ

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী ঈমানের দাবীদার কোন ব্যক্তি মুনাফিক বলে গণ্য হবে যদি জানা থাকার পরও সে-

১. প্রকাশ্যে বা গোপনে, এক বা একাধিক, মৌলিক বা অমৌলিক আমলে সালেহ খুশী মনে পালন না করে বা তার বিপরীত কাজ করে।

২. ইসলামের এক বা একাধিক, মৌলিক বা অমৌলিক বিষয় নিয়ে প্রকাশ্যে বা গোপনে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে,

৩. প্রকাশ্যে বা গোপনে ইসলামের এক বা একাধিক, মৌলিক বা অমৌলিক বিষয় ঘৃণা করে,

৪. অপরকে খুশি মনে ইসলামের এক বা একাধিক মৌলিক বা অমৌলিক বিষয় পালন করতে নিরুৎসাহিত অথবা ইসলাম বিরুদ্ধ কাজ করতে উৎসাহিত বা সাহায্য-সহযোগিতা করে।

গুনাহ্গার মু'মিন ও কাফিরদের নেক্‌কার মু'মিন হওয়ার উপায়

ক. গুনাহ্গার মু'মিনদের নেক্‌কার মু'মিন হওয়ার উপায়

ইসলামে গুনাহগার মু'মিনদের দুনিয়াতে গুনাহ মাফ হওয়ার উপায় হল তওবা ও নেক আমল। নেক্ আমলের মাধ্যমে শুধু ছোট (ছগীরা) গুনাহ মাফ হবে। আর তওবার মাধ্যমে মানুষের হক ফাঁকি দেয়ার গুনাহ্ ব্যতীত অন্য সকল গুনাহ মাফ হবে, তবে সে তওবা করতে হবে গুনাহ করে ফেলার সাথে সাথে অথবা মৃত্যু আসার এতটুকু সময় পূর্বে যখন ব্যক্তির সজ্ঞানে এবং সক্ষমতায় একটি গুনাহ্ করার সুযোগ আসলে তা থেকে দূরে থাকা বা একটি নেক আমল করার মত অবস্থা আছে।

খ. কাফিরদের নেক্‌কার মু'মিন হওয়ার উপায়

একজন কাফির যদি খালিস নিয়াতে ঈমান এনে ঈমানের দাবী অনুযায়ী আমলে সালেহ করা আরম্ভ করে তবে সে নেক্‌কার মু'মিন বলে গণ্য হবে। তবে সে ঈমান মৃত্যুর অন্তত এতটুকু সময় পূর্বে আনতে হবে যখন সজ্ঞানে তথা বুঝে-শুনে ঈমান আনা এবং সজ্ঞানে ও সক্ষমতায় একটি আমলে সালেহ্ করার অবস্থা তার থাকে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, 'কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কী?' নামক বইটিতে।

ঈমান ও আমলের উপর ভিত্তি করে জীবিত অবস্থায় পৃথিবীর সকল মানুষ যে সকল ভাগে বিভক্ত থাকবে

ক. একজন মানুষ জীবিত অবস্থায় কোন না কোন বিশ্বাসে অবশ্যই বিশ্বাসী হবে। অর্থাৎ তাকে কালেমা তাইয়্যেবায় অন্তর থেকে বিশ্বাসী অথবা অবিশ্বাসী হতেই হবে। সুতরাং জীবিত অবস্থায় মানুষকে বিশ্বাসের দৃষ্টিকোণ থেকে হয় মু'মিন অথবা কাফির এ দু'বিভাগের কোন এক বিভাগে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

খ. জীবন পরিচালনা করতে যেয়ে একজন মুমিনকে কাজ অবশ্যই করতে হবে। আবার ছোট বড় যেকোন একটি আমলে সালেহ মু'মিনের ছগীরা (ছোট) গুনাহ রহিত করে দেয়। যেমন সুবহানাল্লাহ, আল্‌হামদু লিল্লাহ, আল্লাহু আক্‌বার তাসবীহগুলোও আমলে সালেহ।

একজন মু'মিন আল্‌হামদুলিল্লাহ্ বললেও তার অতীতের ছগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যায়। সুতরাং একজন মু'মিনের আমলনামায় ছগীরা (ছোট) গুনাহ উপস্থিত থাকার কথা নয়।

তাই আমলের উপর ভিত্তি করে পৃথিবীর সকল মু'মিন জীবিত অবস্থায় নিম্নোক্ত ভাগে বিভক্ত থাকবে-

১. নেক্‌কার মু'মিন,
২. ছগীরা গুনাহ্‌গার মু'মিন (না থাকার সম্ভাবনা বেশী),
৩. মধ্যম গুনাহ্‌গার মু'মিন,
৪. সাধারণ কবীরা গুনাহ্‌গার মু'মিন,
৫. কুফরী গুনাহ্‌গার মু'মিন,

ঈমান ও আমলের উপর ভিত্তি করে মৃত্যুর সময় পৃথিবীর সকল মানুষ যে সকল ভাগে বিভক্ত থাকবে

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে, কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী একজন কাফির বা গুনাহগার মু'মিন যদি মৃত্যুর যুক্তিসঙ্গত সময় পূর্বে খালিস নিয়াতে তওবা করে বাকি জীবন ঈমানের দাবি অনুযায়ী সঠিকভাবে চলে, তবে মহান আল্লাহ্ তার পূর্বের কৃত সকল গুনাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু সকল কাফির বা গুনাহগার মু'মিনের সে সুযোগ হয় না বা হবে না।

তাই সহজেই বলা যায় মৃত্যুর সময়ও পৃথিবীর সকল মানুষ ঈমান ও আমলের ভিত্তিতে নিম্নোক্তভাবে বিভক্ত থাকবে-

১. নেক্‌কার মু'মিন,
২. ছগীরা গুনাহ্‌গার মু'মিন (না থাকার সম্ভাবনা বেশী),
৩. মধ্যম (না ছগীরা না কবীরা) গুনাহ্‌গার মু'মিন,
৪. সাধারণ কবীরা গুনাহ্‌গার মু'মিন,
৫. কুফরী গুনাহ্‌গার মু'মিন।

বিষয়টি যে সত্য তার প্রমাণ হচ্ছে কুরআন (মুহাম্মদ: ২৭) ও হাদীসের সে সকল বক্তব্য যেখান থেকে জানা যায় মৃত্যুর পর আলমে বরযখ থেকে পুরস্কার বা শাস্তি আরম্ভ হবে। যেহেতু মৃত্যু হবে নেক্‌কার মু'মিন, গুনাহগার মু'মিন বা কাফির হিসেবে, তাই প্রাথমিক পুরস্কার বা

শাস্তি মৃত্যুর পরপরই শুরু হয়ে যাবে। আর চূড়ান্ত পুরস্কার বা শাস্তি তথা বেহেশত বা দোযখের মান (Grade) নির্ণিত হবে চলতে থাকা আমল (আমলে জারিয়াহ্) বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর। অর্থাৎ কিয়ামতের পর চূড়ান্ত বিচারের দিনে।

ঈমান ও আমলের উপর ভিত্তি করে মানুষের শ্রেণী বিভক্তির চিত্ররূপ

ঈমান ও আমলের উপর ভিত্তি করে জীবিত অবস্থায় বা মৃত্যুর সময় সকল মানুষের উপরোল্লিখিত শ্রেণী বিভক্তির চিত্ররূপটি হবে নিম্নরূপ-

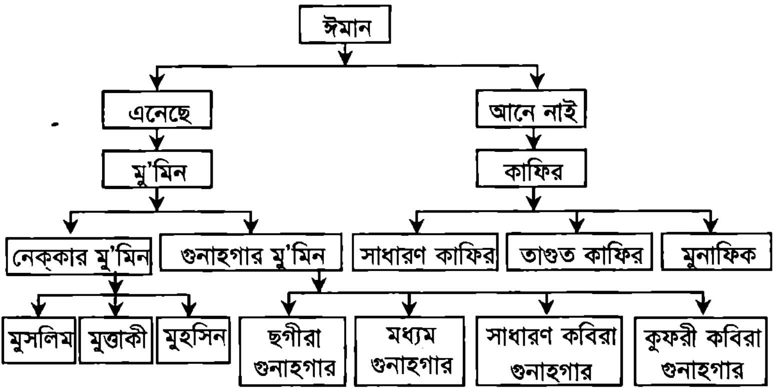

শেষ কথা

ঈমান, আমল, ওজর, অনুশোচনা, উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ইত্যাদির মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে পুস্তিকায় উল্লেখিত কুরআন, হাদীস ও বিবেক বুদ্ধি সমর্থিত জ্ঞান সমাজের মধ্যে ব্যাপকভাবে অনুপস্থিত। তাই বর্তমান মুসলিম বিশ্বে সওয়াব, গুনাহ, মু'মিন, নেককার মু'মিন, মুসলিম, গুনাহগার মু'মিন, কাফির, ঈমান থাকলে পরকালে বেহেশত পাওয়া না পাওয়া, শাফায়াতের মাধ্যমে পরকালে বেহেশত পাওয়া না পাওয়া ইত্যাদি সম্বন্ধে নানারকম জাতি বিধ্বংসী ভুল ধারণা বিদ্যমান। আশা করি ঐ সকল বিষয়ে উপস্থিত থাকা ভুল ধারণাসমূহ দূর করতে পুস্তিকাটি, জানতে-বুঝতে আগ্রহী বিবেকসম্পন্ন মুসলমানদের উপকারে আসবে।

ঈমান থাকলে গুনাহের কাজ করলেও সরাসরি বেহেশত পাওয়া যাবে-ব্যাপকভাবে প্রচারিত এ কথাটি নিয়ে আলোচনা করেছি 'পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী ঈমান থাকলেই বেহেশত পাওয়া যাবে-বর্ণনাসম্বলিত হাদীসমূহের সঠিক ব্যাখ্যা' নামক বইটিতে।

আর ঈমান থাকলে দোযখে যাওয়ার ন্যায় গুনাহ্ থেকে বা দোযখে যাওয়ার পরও শাফায়াতের মাধ্যমে মুক্তি পেয়ে অনন্তকালের জন্যে বেহেশত যাওয়া যাবে-ব্যাপকভাবে চালু হয়ে যাওয়া এ কথাটি নিয়ে আলোচনা করেছি 'পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী শাফাতের মাধ্যমে দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?' নামক বইটিতে।

ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে জানানোর জন্যে সকল পাঠকের নিকট অনুরোধ থাকল। মহান আল্লাহ্ আমাদের সকলকে সঠিকভাবে ইসলামকে জানা, বুঝা ও আমল করার মাধ্যমে দুনিয়া ও পরকালে শান্তিতে থাকার তৌফিক দান করুন। আমিন!

লেখকের বইসমূহ

বের হয়েছে –

- ❑ **পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক , বুদ্ধি অনুযায়ী –**

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য
২. নবী রাসূল (সা.) প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁদের সঠিক অনুসরণের মাপকাঠি
৩. নামাজ কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মু'মিনের ১নং কাজ এবং শয়তানের ১ নং কাজ
৫. ইবাদাত কবুলের শর্তসমূহ
৬. বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. ইসলামের মৌলিক বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ হাদীস কোন্‌গুলো তা জানা ও বুঝার সহজতম উপায়
৯. ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করলে গুনাহ হবে কি হবে না
১০. আল-কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি–মানুষ রচিত আইন না কুরআনের আইন?
১২. ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলা
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. মু'মিন ও কাফিরের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ
১৫. 'ঈমান থাকলেই বেহেশত পাওয়া যাবে' বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা
১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে কবীরা গুনাহ বা দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. 'তাকদীর পূর্ব নির্ধারিত' – কথাটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি- প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. হাদীসশাস্ত্র অনুযায়ী, সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্যে শিরক বা কুফরী নয় কি?
২২. গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ
২৩. অমুসলিম সমাজে মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে কি?

বের হওয়ার অপেক্ষায় –

❑ পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী –

১. সঠিক স্থানে ভোট দেয়া কত বড় সওয়াব এবং ভোট না দেয়া বা ভুল স্থানে দেয়া কত বড় গুনাহ

প্রাপ্তিস্থান

❑ আধুনিক প্রকাশনী
প্রধান কার্যালয়: ২৫ শিরিশদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা, ফোন: ৭১১৫১৯১

শাখা অফিস: ৪৩৫/৩/২ ওয়ার্লেছ রেলগেইট, বড় মগবাজার,

ফোন: ৯৩৩৯৪৪২

❑ ইনসাফ ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও দি বারাকাহ্ কিডনী হাসপাতাল

১২৯ নিউইস্কাটন রোড, ঢাকা। ফোন: ৯৩৫০৮৮৪, ৯৩৫১১৬৪, ০১৭১৬৩০৬৬৩৭

❑ দি বারাকাহ্ জেনারেল হাসপাতাল , ৯৩৭ আউটার সার্কুলার রোড
রাজারবাগ, ঢাকা। ফোন : ৯৩৩৭৫৩৪, ৯৩৪৬২৬৫

❑ আহসান পাবলিকেশন, কাঁটাবন, মগবাজার, বাংলাবাজার, ঢাকা
ফোন: ৯৬৭০৬৮৬, ৭১২৫৬৬০, ০১৭১১৭৩৪৯০৮

❑ তাসনিয়া বই বিতান
৪৯১/১ ওয়্যারলেছ রেলগেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা। ফোন:০১৭১২-০৪৩৫৪০

❑ ইসলাম প্রচার সমিতি, কাঁটাবন, ঢাকা। ফোন: ৮৬২৫০৯৭

❑ মহানগর প্রকাশনী, ৪৮/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫৬৬৬৫৮-৯, ০১৭১১-০৩০৭১৬

❑ এছাড়াও অভিজাত লাইব্রেরীসমূহে